**বিড়ালের বিলাপ**

মিসেস এলেনর একাই থাকেন বাড়িটিতে। কয়েক যুগ আগেই স্বামী মারা যান ভিয়েতনামের যুদ্ধে।

এখন বয়সের ভারে ন্যুজ। প্রতিটি লাইন তার মুখের উপর খোদাই করে একটি অজানা গল্প, একটি যাত্রা পথ। তার চোখ, প্রাচীন কূপের মতো, যেন এক প্রাঞ্জল গভীরতায় অতীতের মধুর স্মৃতিগুলোকে খুঁজে ফিরে। আনন্দের উচ্ছলতায় কখনো জ্বলজ্বল করে উঠে। আবার ঠিক কিয়ৎ পরেই কোন এক বিষাদের জ্বালা দুচোখের পাতায় কান্নার পরশ বুলিয়ে যায়, জেগে উঠে বুদবুদ জলের ফোটা, গাল বেয়ে পড়ে চিবুকে। বুঝতে পারে না। চোখের দুপাশের চামড়া নেতিয়ে গেছে। প্রচণ্ড ঝড়ে হেলে পড়া দূর্বা ঘাসের মতো। আগের মতো তেমন আর গায়ে শক্তি নেই। সোফায় সোজাসুজি হয়ে বসতে পারে না। বসতে গেলেই পা দুটি লম্বালম্বি চিবুক ছুঁতে চায়। তার হাসির মৃদু বক্ররেখা অর্ধ চন্দ্রিমার মুখে গল গল করে বলে যায় কষ্ট সহ্য করার কথা। হাতের রেখাগুলো খুব স্পষ্ট। বছরের পর বছর পরিশ্রম করে, এখন ভঙ্গুর ধ্বংসাবশেষের মতো বিশ্রাম নেয়, তবুও জীবনের বুননে জাদু বুনতে এখনো সক্ষম। তার জীবন যেন একটি জীবন্ত ঘটনাক্রম, সময়ের উত্তরণের সাক্ষী, হাতের মুঠিতে শক্ত করে ধরা লাঠির জীবনের বছরগুলিতে যেন অনুগ্রহের মূর্ত প্রতীক।

অতনুদের পড়শি। অতনুর বয়েস এখন পনের। পাশের বাড়িটিতেই থাকে। এই জগৎ সংসারে আপন বলতে এক মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই মিসেস এলেনরের। সেও সত্তরে পা ছুঁই ছুঁই করে। সংসার নিয়ে থাকে অনেক দুরে। বছরে একবার মাকে দেখতে আসে। দুয়েকদিন থাকে। তবে মাঝে মাঝে ফোনে কথা বলে। ডাকে চিঠি পাঠায় বছরে দুটি। মায়ের জন্ম দিন আর ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে। মেয়ের চিঠিগুলো থরে থরে সাজিয়ে রাখে সযত্নে। গত পঁচিশ বছরের একটি চিঠিও হারিয়ে যায় নি। অবসরে এগুলিতে হাত দেয়, চোখে চশমা জড়িয়ে চোখের কাছে এনে পড়তে থাকে। পড়া শেষ হলে কিছুক্ষণ বুঁদ হয়ে থাকে। হাতের হাড্ডিসার দুর্বল আঙ্গুলে চোখ মুছে।

কয়েকবার আদর করে ডেকে নিয়ে অতনুকে চকলেট দিয়েছে, বেলার সাথে খেলতে দিয়েছে। রূপকথার গল্প শুনিয়েছে। তার ছেলে বেলার দুষ্টুমির কথা যত্ন করে অতনুকে শুনিয়েছে। বেলা অতনুর খুব প্রিয়। ঘরে এলেই বেলা অতনুর পায়ের কাছে এসে বসে। মুখ দিয়ে পা ঘষে দেয়। অতনু তখন খিল খিল করে হেসে উঠে। হাত দিয়ে বেলার মাথায় আদর করে দেয়। অতনুকে বিশ্বস্ত বন্ধু বলে মন থেকে মেনে নিয়েছে।

বেলা এলেনরের বিড়ালের নাম। খুব সুন্দরী। এলেনর হেসে বলে সেলেব্রিটি ক্যাট।

অতনু বিড়াল আনার জন্য ওর মাকে যে কতবার বলেছে তার হিসেব নেই। বিড়ালকে খুব ভালোবাসে অতনু। যখনই বিড়াল আনার বায়না ধরে মা তখন অতনুর গলা জড়িয়ে গুনগুন গানের সুরে বলতে থাকে-`আমার ছেলে ভালো ছেলে ক্যাট কিনতে চায়, ক্যাটের সাথে খেলতে খেলতে বড়ো হতে চায়।“ হি হি করে হাসিতে ফেটে পড়ে অতনুর মা। অতনু তখন হা.হা.হা করে লাফিয়ে উঠে বলতে থাকে “কিনে দেবে তো?“

তখন মা মোলায়েম গলায় বলতে থাকবে-“সুন্দর একটা ক্যাট তোমার জন্য কেনা হবে। এ নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। তবে তোমাকে আগে পরীক্ষায় ভালো করতে হবে।“ এই ভাবেই চলবে কিছুক্ষণ মা ছেলের দেনা-পাওনার খিস্তি-খেউরি। এক সময় পরীক্ষাও শেষ হয়ে যায়, নতুন স্কুল ইয়ারও শুরু হয় কিন্তু ক্যাটের কথা আর কারোরই মগজের কোষে ধরা দেয় না। বেমালুম লাপাত্তা! তবে এখন আর বিড়ালের প্রয়োজন নেই। বেলা প্রায় সময়ই অতনুদের গার্ডেনে এসে খেলা করে, রোদ পোহায়, হাঁটা চলা করে। নিজের রুম থেকে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে কিশোর অতনু বেলার আলামতের সাক্ষী হয়। কখনো সখনো খিল খিল করে হেসে উঠে নিজের অজান্তেই।

তবে এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডে এলেনরের গত কয়েক বছর ধরে সত্যিকারের আপন এবং পরম বন্ধুটি হলো `বেলা`।

বেলা, খুব দয়ালু, মনিব ভক্ত। এলেনর যেন তার সাক্ষাৎ মা, পরম দেবতা। এই রকম মাংসাশী স্তন্যপায়ী প্রাণী জগৎ সংসারে দ্বিতীয়টি আর চোখে পড়েনি অন্তত বৃদ্ধা এলেনরের তাই ধারনা। বেলার খুব করুণার শরীর। কমনীয়তা চোখে ভেসে উঠে। তার মনিবকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখে। তার মসৃণ আবলুস পশম নরম সূর্যালোকের নীচে জ্বলজ্বল করে। তার পান্না চোখে, যেন স্বর্গীয় রাজপ্রাসাদের মূল্যবান রত্নগুলির মতো দ্যুতি ছড়ায়। কি এক রহস্যময় গভীরতা ধারণ করে যা মহাবিশ্বের সকল রহস্যকে প্রতিফলিত হয় বেলার মধ্যে। ধীরে ধীরে যখন হাঁটে তখন তার শরীরের কাঁপুনিতে ধরা দেয় ধ্রুপদীয় নাচের বাহার। নির্ভুল স্বর-মাধুর্যের গোধূলির কলতান। আর বেলা যখন তার সুন্দর থাবা ফেলে হালকা-ভাবে পায়চারি করে তখন মনে হয় খুব যেন শ্রদ্ধার সাথে পৃথিবীর মাটিকে স্পর্শ করছে। বেলার চোখের চাহনি আর চলার ভঙ্গিতে এমন মুগ্ধতার মন্ত্র বুনন করে যা তার দিকে তাকিয়ে থাকা সকলকে আচ্ছন্ন করে। বেলা শুধু বিড়াল নয়,এলেনরের জীবনে এ যেন বেঁচে থাকার নির্ভরতা, পরম আত্মার আত্মীয়, বুকের কাছে শীতের রাতে লেপ মুড়ি দিয়ে ডান হাতে ধরে শুয়ে থাকার এক অমলিন উৎপলতা।

বেলা যেন এলেনরের অনেক দিন আগে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় সন্তান। তাই খুব বড্ডো ভালোবাসে বেলাকে। একসাথে থাকতে থাকতে এমন একটি বন্ধন তৈরি করেছে যা শব্দকে অতিক্রম করে, যা মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসাকে অতিক্রম করে। এ যেন বছরের পর বছর সাহচর্যের মাধ্যমে বোনা একটি নীরব বোঝাপড়া। বেলার দিনগুলি মিসেস এলেনরের স্নেহের উষ্ণতায় পরম আনন্দে কাটছিল, তার ক্ষতবিক্ষত হাতের মৃদু আঘাত থেকে তার কানে ফিসফিস করে স্নেহের কোমল বচসা পর্যন্ত। জীবন ছিল সহজ এবং তৃপ্ত। প্রতিটি মুহূর্ত যেন তাদের ভাগ করা অস্তিত্বের শান্ত আলিঙ্গনে লালিত।

বেলাকে মাঝে মধ্যে রানী বলে ডাকতো এলেনর।

বেলা যেন বিড়াল সমাজের সাক্ষাৎ রানী। সাড়া শরীর থেকে যেন একটি লুকানো স্রোতের দূরবর্তী সুরের মধ্যে সৌন্দর্যের অপূর্ব এক মূর্তি আবির্ভূত হয়। মেঘের আবরণের মধ্য দিয়ে চাঁদের আলোর মতো লাবণ্যময়। তার গায়ের ধবধবে দুধ সাদার সাথে মিশে থাকা কালো পশম যেন গোধূলির রঙের একটি অমলিন প্রভা সৃষ্টি করে। চোখে মুখে দোলে উঠে রাজপ্রসাদে স্বর্ণালংকারে আবৃত কোন এক রাজ রানীর নরম চকচকে ঝলক। বেলার প্রতিটি সূক্ষ্ম পদক্ষেপের সাথে এমনভাবে নড়াচড়া করে যেন হাওয়া নিজেই কোরিওগ্রাফি করেছে। কমনীয়তা এবং ভদ্রতার একটি মধুর সংগীত বেজে উঠে। অন্ধকারে গুড়গুড় ইয়োউ ইয়োউ মিউ মিউ কিংবা হিস হিস করে যখন শব্দ করে তখন প্রশান্ত রাতের বাতাসে কুঁজোর একটি সুর অনুরণিত হয়। মনে হয় পেঁচার নিশাচর কোরাসের সাথে কি অপূর্ব সামঞ্জস্যপূর্ণ। তার কণ্ঠস্বর নিঃসৃত প্রতিটি উচ্চারিত শব্দাংশের সাথে কি যাদুকরী মুগ্ধতা বয়ন করে।

বেলার জন্যই হয়তো এলেনর এখনো বেঁচে আছে। এলেনর যখন বাথরুমে যায় বেলা তখন দরজার সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে থাকে। যেন বিশ্বস্ত প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। বেরুতে একটু দেরী হলেই হিস হিস মিউ মিউ করে পর পর তিনবার আওয়াজ করবে। এর মধ্যে এলেনরকে “ডোন্ট ওয়ারী” বলে সাড়া দিতে হবে। বেলা তখন বুঝে নেবে তার মনিব ঠিক ঠাক আছে। চিন্তার অহেতুক কারন নেই। বেলার উপস্থিতিতে পৃথিবীটা যেন অনুগ্রহ করে এলেনরের শ্বাসটা ধরে রেখেছ। তা না হলে যে বড্ডো অবিচার করা হবে। যমদূতের যেন দয়ালু শরীর। বেলার জন্য বৃদ্ধাকে আর কয়েকটা দিন বেশী থাকার বন্দোবস্ত করতে পারলে ক্ষতিই বা কি? এতে বেলাও যে শান্তিতে আরো কিছুটা দিন এলেনরের চামড়া ঝুলে থাকা শরীরের ভাঁজে কুঁজো হয়ে শুয়ে মনিবের সময়ের খরতাপে পুড়ে যাওয়া হাতের আঙ্গুলে বুলিয়ে দেওয়ার পরশ অতি সুখে চোখ বুজে অনুভব করতে পারবে।

বেলার বেশ বুদ্ধি! খুব মনিব ভক্ত! তার মোহে আর করুণায় যেন বিমোহিত বেলার মনিব। আর তাইতো এলেনর কখনো ভাবেনা যে বেলা একটি স্তন্যপায়ী ফেলিস কেটাস বংশের গৃহপালিত প্রাণী `বিড়াল।` এলেনরের কাছে বেলা নিছক একটি বিড়াল নয় বরং একটি স্বর্গীয় সত্তা, চাঁদ এবং তারার একটি যাদুঘর। যারা তার পার্থিব সৌন্দর্যের দিকে তাকাতে সাহস করে তাদের উপর বেলা তার জাদু ঢেলে দেয়। নিজের সন্তানের মতোই ভালোবাসে, আদর করে, হাড্ডিসার হাতের আঙ্গুলে মোলায়েম করে প্রতি সন্ধ্যায় নিজের কোলে রেখে বেলার গা বুলিয়ে দেয়। কখনো বা চিরুনি দিয়ে আঁচড়িয়ে দেয়। বেলা তখন চোখ বুঝে ১০ ফিট নীচে আরামের রাজ্যে ডুবে যায়।

বেলা কোন সাধারণ বিড়াল ছিল না। বেলা যেন একজন দায়িত্ববান সজাগ অভিভাবক। এলেনরের দেখ ভাল যেন তার কাজ। তাই সর্বদা তার প্রিয় মালিকের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখত। মনিবের আশে পাশেই ঘুর ঘুর করতো।

এলেনরের চলাফেরায় খুব কষ্ট। বয়সতো কম হলো না। নব্বই ছুঁই ছুঁই করছে। কুঁজো হয়ে হাঁটতে হয়। তবে এখন আর বেশী বাইরে যায় না। সপ্তাহে দুইদিন পাশের কর্নার সপে বেলাকে নিয়ে যাবে। বাড়ীর বাগানেই মাঝে মাঝে বসে, বেলাকে নিয়ে খেলে। এতে এলেনরের ভলো লাগে। মাথাটা একটু সুখ সুখ অনুভব করে। শরীরটা কিছুটা শান্ত হয়। কাউন্সিল থেকে লোক এসে সপ্তাহের বাজারটা করে যায়। পুড়ো বাড়ীটা পরিষ্কার করে যায়। মেশিন দিয়ে কার্পেট ঠিক ঠাক করে যায়। এতে এলেনর মনে মনে কিছুটা কষ্ট পায় এই ভেবে যে নিজের কাজটাও অন্যকে দিয়ে করাতে হয়। তবে হাল ছেড়ে দেয়নি। নিজের খাবারটা নিজেই বানায়। নিয়মিত বেলাকে খাবার দিতেও ভুলবে না।

বেলাও এলেনরকে নানাভাবে সাহায্য করে। শপিং করার সময় মনিবের সাথে সাথে দোকানে যায়। রাস্তা পারাপারের সময় `পথচারী ক্রসিংএর মধ্যে এসে হাত জোড় করে বেলা দুপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ট্রাফিক মাষ্টারের মত। তবে গ্রীন লাইট পড়লেই বেলা একাজটা করবে। মনিবই বেলাকে রাস্তার নিয়ম-কানুনগুলো শিখিয়েছিল। এলেনর ধীরে ধীরে হেঁটে রাস্তার অন্য প্রান্তে যাওয়ার পরেই বেলা সরে যেত। বেলাকে এ অবস্থায় দেখে পথচারী কিংবা গাড়ী চালকদের নরম হৃদয়ে কিছুটা অন্যরকম দয়ার ঢেউ উথলিয়ে উঠতো।

একদিন এক শীতের সন্ধ্যায় বেলার জন্যই এলেনরের জীবন বেঁচে যায়। সেদিন মিসেস এলেনর রান্নাঘরে রাতের খাবার তৈরি করছিলেন। ঠিক তখনই বিপর্যয়টা ঘটে। ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক তারের কারণে রান্নাঘরে আগুন ধরে যায়। এলেনর সেটা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারেনি। ধীরে ধীরে ঘন ধোঁয়া পুরো রান্না ঘরটাকে গ্রাস করতে শুরু করে। মুহূর্তের মধ্যেই শ্বাসরোধকারী ধোঁয়া প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠল। মিসেস এলেনর কাঁশতে থাকেন অনবরত, চোখ ঝাঁঝাঁ করছিলো। কিছুই যেন ঠাহর করতে পারছিলেন না। ধোঁয়ায় ভরা কক্ষের মধ্য দিয়ে পথ খোঁজার চেষ্টা করেন। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে সারা শরীরে। হঠাৎ বেলার উন্মত্ত মায়াধ্বনি শুনতে পান। বেলার কন্ঠে বেঁধে দেওয়া ঘন্টার আওয়াজ এলেনরের রুগ্ন কর্নকুহরে এসে ঢুকে। বেলার অস্বাভাবিক আচরণে চমকে গিয়ে এলেনর বেলার ব্যথিত মেওর মিউ মিউ শব্দ অনুসরণ করতে লাগলেন। বেলা দৌড়ে এসে এলেনরের কাপড় মুখে চেপে ধরে ধীরে ধীরে ধোঁয়ার প্রাচীরে গ্রাস করা রান্নাঘর থেকে বসার ঘরে নিয়ে আসে মনীবকে। কাঁশি আর হোছট খেতে খেতে কোন রকমে সামনের দড়জাটা খুলে বাইরে এসে হাঁপাচ্ছিলেন এলেনর। হাতে ভর দিয়ে কোন রকমে ড্রাইভ ওয়েতে বসে পড়লেন। চোখ যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

গা থর থর করে কাঁপছিল মিসেস এলেনরের। এর মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সারা ঘরে। বাইরে আতঙ্কে দেখেছিলেন যে আগুনের শিখা জানালাগুলোকে কিভাবে চাটছে। চারিদিকে ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে। চোখে-মুখে ভয় আর আতংকের ছাপ। গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। মনে মনে ভাবতে লাগলো আজ বেলার জন্যই বেঁচে যায়। তা না হলে ভিতরে আটকা পড়ে যেত, আগুনে পুড়ে যেত। পাশে তাকিয়ে দেখে বেলা মাথা উঁচু করে মনীবের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন গভীর ভাবে ভাবছে। একটু কুঁজো হয়ে দুহাতে বেলাকে বুকে তুলে অনবরত চুমু খেতে লাগলেন। হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

এর মধ্যে বিকট আওয়াজ তুলে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ীটি এসে উপস্থিত হল।

বেলার অটল ভক্তি এবং তড়িৎ চিন্তাভাবনার জন্য মিসেস এলেনর বেলাকে অনেক ধন্যবাদ দিলেন। আদর করে চুমু খেলেন।, যদিও তখনও সারা শরীর ভয়ে কাঁপছিল। সেই দিন থেকে মিসেস এলেনর বেলাকে কেবল একটি পোষা প্রাণী হিসেবে নয়, বেলা যেন মিসেস এলেনরের অভিভাবক দেবদূত হয়ে উঠেন। তার প্রখর ইন্দ্রিয় এবং সীমাহীন ভালবাসা দিয়ে কি সুন্দর করে যেন মিসস এলেনরের দেখভাল করছিল বেলা।

এলেনর যে এলাকায় বাস করে সেটি লন্ডনের একটি অভিজাত নিরিবিলি এলাকা। বাড়িটি ছিল বেশ মনোরম পরিবেশে একটি বড়ো পার্ক ঘেঁষা শান্ত কোণে বেশ ছিম ছাম শালীন, পরিচ্ছন্ন। তবে বিবর্ণ ইটের সম্মুখভাগ অতীতের বিস্মৃত অবশেষের মতো শহুরে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মিশে একাকার হয়ে গেছে। বাড়ির ভেতরে প্রাগৈতিহাসিক যুগের, বর্তমানে অচল ধুলোয় লেপ্টে যাওয়া জিনিসে ঠাঁসা। মনে হয় গত কয়েক বছরে ভেতরে একবার যা ঢুকেছে তা বাহিরে আর যায়নি। তাই ভিতরের বায়ুমণ্ডল ছিল এক বিবর্ণ লালিত্যের। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে আলকাতরা মার্কা কেমন প্রাগৈতিহাসিক আমলের নাসারন্দ্রে উদ্রক সৃষ্টিকারী একটা গন্ধ ভেসে আসে। অপরিচিতদের বমি বমি ভাব আসাটাও অস্বাভাবিক নয়। কাঠের মেঝে পায়ের তলার ধূসরতা লেপ্টে আছে. সময়ের সাথে সাথে ধূসর হয়ে গেছে। ক্লান্ত দেয়ালগুলি, প্রাচীন ফটোগ্রাফ এবং বিবর্ণ পেইন্টিং দিয়ে সজ্জিত, যেন বিগত যুগের মধুর স্মৃতিগুলির গল্প কানের কাছে ফিসফিস করে বলে যায়।

এলেনরের কয়েক যুগ কেটেছে এই বাড়ীটিতে।

পুরনো আসবাবপত্রে সজ্জিত এই বাড়ীর নীচতলায় রয়েছে আরামদায়ক একটি বসার ঘর। এ যেন উষ্ণতা এবং প্রশান্তির একটি অভয়ারণ্যে। অগ্নিকুণ্ডের কাছে বহুদিনের পুরনো একটি জীর্ণ আর্মচেয়ার। এর কুশনগুলি গভীর চিন্তায় মগ্ন অগণিত বিকেলের ছাপ বহন করে, বুকে ধরে রেখেছে হাসি-কান্না, প্রেম-ভালোবাসা আর অগনিত স্মৃতিমালা। মেঝে জুড়ে বিস্তৃত একটি আবৃত কার্পেট। বয়স এবং ব্যবহারের চিহ্ন সবখানে। তাই কিছুটা লেপ্টে থাকা বিবর্ন ধূসরতা। বসার ঘরের দেয়ালের বিপরীতে একটি বুক শেলফ দাঁড়িয়ে আছে খুব কষ্ট করে যুগের ভার বহন করে। অনেক পুরনো কাঠ তাই ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। শেলফের প্রতিটি তাক যুগে যুগে বিস্তৃত সাহিত্যের ভলিউম আর `এনসাইক্লোপেডিয়া অব হিস্ট্রি অব গ্রেট বৃটেন` দিয়ে উপচে পড়ছে। কোন নরম হাতের ছোঁয়া পড়েনি বইয়ের উপরে, লেপ্টে থাকা ধূলোর বাহার দেখেই বুঝা যায়। বইয়ের পাতাগুলি বয়সের ভারে হলুদ হয়ে গেছে।

এখানেই ঝরঝরে খোঁপায় রূপালী চুল টেনে নিয়ে, বুদ্ধিমত্তায় ঝলমল করা সদয় চোখ নিয়ে, মিসেস এলেনর শান্ত করুণার সাথে ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়ান। তার প্রতিটি চলাফেরায় দেখা মেলে একটি ভাল জীবনযাপনের প্রমাণ। আর তার পাশে, সর্বদা তার বিশ্বস্ত বিড়াল সঙ্গী বেলা থাকে। বেলাই এ জীবনে মিসেস এলেনরের সব। একসাথে দুজনে শহরের এই বাড়ীটিতে শান্ত তৃপ্তির একটি জীবন তৈরি করেছিলেন। তাদের বন্ধন সরলতা এবং শক্তিতে অটুট। তাদের এই পুরনো আবাসে তারা যেন একে অপরের সংস্পর্শে সান্ত্বনা খুঁজে পেয়েছিল। তাদের চারপাশের বিশ্বের অন্ধকারে যেন আলোর বাতিঘর। বেলা বেশ ভালোভাবেই জানত কখন মিসেস এলেনরের আরাম দরকার। মনীবের যখন কষ্ট হতো বেলা তখন কোলে কুঁকড়ে শুয়ে পড়ত, মৃদু গলায় এমনভাবে আশ্বস্ত করত যেন সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যখন মনীব খুশি মনে থাকত বেলা তখন ছায়ার পিছনে তাড়া করত, তার লেজ উত্তেজনায় উচু হয়ে থাকত।

হঠাৎ একদিন সব কিছু বদলে যায়।

প্রতিদিনের মত খুব সকালে বেলা ঘুম থেকে উঠে এসে মিসেস এলেনরের বেডে এসে ঘুমায়। মিসেস এলেনর পরম মমতায় বেলাকে বুকে জড়িয়ে কিছুক্ষন খুনসুটি করে। তারপর একসাথে ঘুম থেকে উঠে। কিন্তু আজ বেলাকে মিসেস এলেনর বুকে জড়িয়ে ধরছে না। হাত দিয়ে বেলাকে টেনে ধরছে না। বেলা চোখ তুলে মনীবের দিকে তাকালো। মনীবের চোখ বন্ধ। বেলার বুকটা হঠাৎ কেঁপে উঠলো। বেডের সাথেই লাগানো ছিল প্যানিক বোতাম বা একটি "চিকিৎসা সতর্কতা বোতাম।"আগেও এই বোতামে কয়েকবার চাপ দিয়েছিল মিসেস এলেনর। মুহূর্তেই অ্যম্বুলেন্স চলে আসে। বেলাও ঠিক সেই কাজটি করলো। তার পর মনীবের মাথার কাছেই খুব চিন্তিত মনে অ্যাম্বুলেন্সের অপেক্ষায় ছিল।

নিস্তব্ধ শূন্য ঘরে, যেখানে ভোরের মৃদু আলো পর্দা ভেদ করে আছড়িয়ে পড়েছে, বেলা বিছানার পাশে চুপ করে হাঁটু গেঁড়ে বসেছিল। তার সোনালী চোখ দুঃখে ভারি। সে তার প্রিয় মালিকের স্থির হাতের দিকে ঝাঁকুনি দেয়। তারপর শেষ বিদায়ের মতো একটি মৃদু ফুঁক তার গলা থেকে বেরিয়ে আসে। অতঃপর, দুঃখের প্রথম অশ্রু তার চোখে ভেসে উঠলে, বেলা উপরের দিকে মাথা তুলে `মাও-মাও`-করে কাঁদতে থকে। একটি শোকাবহ কান্না, একটি মর্মান্তিক বিলাপ যেন বাড়ির খালি হলগুলির মধ্য দিয়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।

কিছুক্ষনের মধ্যেই অ্যম্বুলেন্স এলো।

তারপর স্ট্রেচারে করে মৃত মিসেস এলেনরের দেহটা সাদা কাপড়ে ঢেকে অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যায়। হঠাৎ বেলার বুকটা হাহাকার করে উঠে। বুঝতে পারলো দিগন্তের নীচে সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে, মিসেস এলেনর তার ঘুমের মধ্যে নিঃশব্দে চলে গেলেন। বিরাট এক শূন্যতা যেন বাড়িটির খালি ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো। বিষাদের যন্ত্রনায় বেলার সারা শরীরে কাঁপুনি দিয়ে দুচোখের পাতা জলে ভরে গেল। বেলার একসময়ের উজ্জ্বল চোখ এখন অশ্রুতে জ্বলজ্বল করছে।

বিড়ালের বিলাপে হঠাৎ অতনুর ঘুম ভেঙ্গে যায়।

ছুটির দিনটা একটু দেরী করেই ঘুম থেকে উঠে। হঠাৎ `মাও মিউ--- মাও মিউ----- মাও মিউ--- কান্নার কোরাসে অতনু জেগে উঠে। চোখ কচলাতে কচলাতে জানালাটা খোলে বাগানের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। পাঁচটি বিড়াল মুখোমুখি হয়ে, সবগুলো মুখ একটি বিন্দুতে এনে অনবরত বিলাপের সুরে `মাও মিউ--- মাও মিউ----- মাও মিউ` করে কান্না করছে। পঞ্চভূজ হয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ালের এমন কান্না অতনু আগে কখনো শুনেনি।

হঠাৎ নীচ থেকে অতনুর মায়ের কন্ঠ রোদনের আওয়াজকে শ্লথ করে দিয়ে হালকাভাবে অতনুর কর্নকুহরের পাশ দিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায় “অতনু, আমাদের নেইবার মারা গেছে।“

সকালের নিস্তব্ধতায় বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে এই বিষাদের কান্না।

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট